ISSN 1605-2021

লোক-প্রশাসন সাময়িকী
উনচত্বারিংশত্তম সংখ্যা
জুন ২০০৬/জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩

বাংলাদেশ-জাপান সম্পর্ক: একটি পর্যালোচনা

অদুদ রায়হান*

Abstract : *Bangladesh-Japan political relations emerged through reciprocal interest. Japan emphasises the Bangladesh-Japan political relations on the basis of its South Asian policy. In respect of Japan-Bangladesh political relations, Japan always stresses economic interest. Nevertheless political interest is not less important. In Japanese conception it is possible to ensure development through peaceful co-existence and inter-state relationship. In the context of Japan-Bangladesh political relationship Japan gives weight to U.N charter, SAARC goals and Nuclear Disarmament environment.*

ভূমিকা :

দ্রুত বিশ্বায়নের ফলে সমকালীন বিশ্বে রাষ্ট্রগুলোর পারস্পারিক নির্ভরশীলতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতার মধ্যে রাষ্ট্রসমূহ অন্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থকেই প্রাধান্য দেয় (Ford et al, 1976; Frankel, 1969)।[১] বহির্বিশ্বের সাথে কোনও রাষ্ট্রের সম্পর্ক সাধারণত জাতীয় স্বার্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর রক্তস্নাত স্বাধীনতার যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র বিশ্বের মানচিত্রে স্থান দখল করেছে। বাংলাদেশ উৎপত্তির শুরু থেকেই অন্যদেশের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রথাগতভাবেই জাতীয় স্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়ে আসছে। এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের সাথে এশিয়ার সবচেয়ে শিল্পোন্নত দেশে এবং G-৮ এর গর্বিত সদস্য জাপানের সম্পর্ক সময়ের ও রাজনৈতিক পরিক্রমায় আলোচনা করা হয়েছে।[২] ফেব্রুয়ারী ২০০২ বাংলাদেশ-জাপান কূটনৈতিক সম্পর্কের ত্রিশ বছর পূর্তি হয়েছে। তিন দশকের সম্পর্ক পর্যালোচনা দেখা যায় বাংলাদেশের সঙ্গে অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্পর্কের যে ওঠা-নামার পর্যায় পরিলক্ষিত হয়, জাপানের ক্ষেত্রে তা একেবারেই অনুপস্থিত। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের শুরু থেকেই জাপান বাংলাদেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে চলেছে। দীর্ঘ দিনের এই সম্পর্ক এখন এক দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, বিশ্বশান্তি ও স্থিতিশীলতা, জাতিসংঘের কার্যক্রমকে সমর্থনদান, প্যালেস্টাইন সমস্যা বিষয়ে বাংলাদেশ ও জাপানের অবস্থান এক। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রকিয়া জোরদারে জাপানের গভীর সমর্থন রয়েছে। এমনকি সাহায্যের শর্ত হিসেবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে এক করে দেখা হচ্ছে।

কৃষি উন্নয়ন, মৎস্য আহরণ প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান ও উত্তোলন এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে জাপান বাংলাদেশের সাথে কাজ করছে। কারণ এসব সমস্যা

* সহকারী অধ্যাপক, রাজনীতি ও প্রশাসন বিভাগ, গণবিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

জাপানকে একদিন পীড়িত করেছিল। ফলে তা দু'দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে ঘনিষ্ট করে তুলেছে। বাংলাদেশের সাথে জাপানের সাংস্কৃতিক চেতনাগত সাদৃশ্য রয়েছে। বাঙ্গালীদের মতই জাপানীরা সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগী ও শ্রদ্ধা শীল এবং ধর্মবিষয়ে সহিষ্ণু।

এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের সাথে এশিয়ার সবচেয়ে শিল্পোন্নত দেশ এবং G-৮ এর গর্বিত সদস্য জাপানের সম্পর্ক সময়ের ও রাজনৈতিক পরিক্রমায় আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান দাতাদেশ জাপান উদার ও সাম্প্রদায়িক চেতনামুক্ত। উভয় দেশের পতাকারই রয়েছে অনেক সাদৃশ্য, শক্তি ও মহাজাগরণের প্রতীক সূর্য শোভা পাচ্ছে দু'দেশের পতাকায়।[৩] আলোচ্য প্রবন্ধে বিভিন্ন তথ্যের আলোকে বাংলাদেশ-জাপান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারের শাসনকালের রাজনৈতিক সম্পর্কের গতি প্রকৃতি ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধে জাপানের ভূমিকা

১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জাপান সরকারের ভূমিকা রাখার তেমন সুযোগ ছিল না। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সেই সময়ে জাপানের অবস্থানও অবশ্য বিশ্বের বৃহত্তর রাজনৈতিক মঞ্চে টোকিওর জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালনের সুযোগ তৈরি করে দেয়নি। বলা যায়, মার্কিন প্রভাব বলয়ের সরাসরি আওতাধীন থাকা অবস্থাতেই অর্থনৈতিক সাফল্য বিশ্ব রাজনীতির নতুন যে দুয়ার জাপানের সামনে উন্মুক্ত করে দেয়, সত্তরের দশকের শুরুতেই সেই পথে জাপানের কেবল হাঁটি-হাঁটি পা-পা যাত্রা।[৪] ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তার কোন সম্পৃক্ততা তেমনভাবে লক্ষ্য করা যায়নি। মুক্তিযুদ্ধের সেই ঘটনাবহুল দিনগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র, চীনের সম্পর্ক স্বাভাবিক করে নেয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে তার মিত্র জাপানকে কোন কিছুই পূর্বে অবহিত করেনি। এটি ছিল জাপানের জন্য দুঃখজনক অভিজ্ঞতা যা তার রাষ্ট্রীয় অবস্থানকে বিশ্বে স্পষ্ট করে তোলে। তাই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণের সুযোগ জাপানী নীতি নির্ধারকদের সামনে ছিল খুবই কম। কিন্তু জাপানী সাধারণ জনগণ বাংলাদেশের পক্ষে মতামত সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীদের জন্য ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো ছাড়াও জাপানী বিভিন্ন সংগঠন মুক্তিযুদ্ধে সরকারের সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণের জন্য চাপ প্রয়োগের বিভিন্ন পন্থাও অবলম্বন করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রথম থেকেই জাপান সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। বাংলাদেশের শরণার্থীদের প্রতি সরকার সবসময় সহানুভূতিশীল ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও বাস্তবসম্মত কোন পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়নি। বরং তাঁরা এ বিষয়ে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী জনাব আনোয়ারুল করিম মুক্তিযুদ্ধে জাপানের ভূমিকা সম্পর্কে বলেন, "যদিও জাপান সরকার, মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই বাংলাদেশের ঘটনাকে অভ্যন্তরীণ সমস্যা বা সংঘর্ষ বলে মনে করে এবং এ বিষয়ে তাদের জড়িত হওয়া ঠিক হবে না বলে মনে করে তথাপি যখনই আমরা জাপানী কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি তখনই আমরা তাঁদের সমর্থন ও সহানুভূতি পেয়েছি। ডায়েটের

সদস্য অথবা অন্যান্য জাপানী রাজনীতিবিদরা প্রকাশ্যভাবে আমাদের সমর্থন না করলেও কৌশলে সমর্থন দিয়েছিলেন।"[৫] জাপান-বাংলা মৈত্রী সমিতির চেয়ারম্যান তোশুইওসি নারা (Tsuyoshi Nara) বলেন, "যদিও বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশ্ব রাজনীতির চাপে জাপান সরকারীভাবে তাদের সমর্থন জানাতে পারছিল না, তারপরও আমরা গোপনভাবে সরকারের কাছে সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়েছিলাম। যখন আমি বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য জাপানী কর্তপক্ষের কাছে মানবিক সাহায্য পাঠানোর আবেদন করলাম তখন আমাকে তিন সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ করতে বলা হয়েছিল। পরে যখন আমি তাদের প্রক্রিয়াটি দ্রুত করার কথা বললাম তখন তাঁরা এক সপ্তাহের মধ্যে পুরো প্রক্রিয়া শেষ করল এবং বাংলাদেশে রিলিফ পাঠানো শুরু করল।[৬]

বাংলাদেশ-জাপান সম্পর্ক রাজনৈতিক প্রেক্ষিত

জাপান তার দক্ষিণ এশীয় নীতির আলোকে বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের বিষয়টি প্রাধান্য দেয়। দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব এবং এই অঞ্চলে পরাশক্তির ভূমিকা ও সাম্প্রতিক বিশ্ব-ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং জাতীয় স্বার্থের বিষয়টি জাপানের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়ে আসছে। তাই বাংলাদেশ-জাপান রাজনৈতিক সম্পর্ক পর্যালোচনার পূর্বে দক্ষিণ এশিয়ায় জাপানী নীতি সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন।

ক) দক্ষিণ এশিয়ায় জাপানী নীতি

জাপান দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্র বিশেষ করে বাংলাদেশের কাছে কি প্রত্যাশা করে? জাপান বাংলাদেশকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহায্য সহায়তা করছে তা কি এশিয়ার অনুন্নত দেশ হিসেবে না কি এর পেছনে ভিন্ন কোন কারণ রয়েছে তাও বিশে-ষণ করে দেখা প্রয়োজন। জাপান মনে করে, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় অনেকগুলো পরিবর্তন এসেছে। প্রথমটি হচ্ছে অর্থনৈতিক সামাজিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া। দ্বিতীয়ত, সামরিক ক্ষেত্রে ক্ষমতা বৃদ্ধির উলে-খযোগ্য অগ্রগতি এবং তৃতীয়ত, চীনা অর্থনীতির বিস্তৃতি। এই সমস্ত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে জাপান নতুন কৌশল নিয়েছে, যার ভিত্তি হচ্ছে জাতীয় স্বার্থ। এই জাতীয় স্বার্থের প্রথমটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়টি, মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থা (Free Trade System) সমর্থন করা। তৃতীয়টি হচ্ছে, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার রক্ষা করা। এই বিষয়গুলোর মধ্যে জাপান তথা এশিয়ার নিরাপত্তা বিষয়টি নিহিত রয়েছে বলে জাপানী নীতি নির্ধারকরা মনে করেন।[৭]

দক্ষিণ এশিয়ায় গত দুই দশক ছিল ভারত ও পাকিস্তানের গোপন অস্ত্রায়ন কর্মসূচি। আন্ত র্জাতিক কোনো স্বীকৃতির প্রয়াস এতে ছিল না। দুই দেশই আন্তর্জাতিক চাপের মুখোমুখি হতে চায়নি। সেদিক থেকে গোপন অস্ত্রায়ন কর্মসূচি বজায় রাখার স্বার্থে যুদ্ধ পরিহার নিতান্তই অনিবার্য হিসেবে গৃহীত হয়েছে আণবিক অস্ত্রায়ন ধারাকে ধরে রাখার স্বার্থে।[৮] বিহার প্রদেশের বুদ্ধগয়াতে ছয় বছর কঠোর সাধনা করে গৌতম বুদ্ধ 'অহিংসা পরম ধর্ম', 'জীব হত্যা মহা পাপ' এই দর্শন আবিস্কার করেছিলেন। কিন্তু শান্তি ও জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের

দেশ ভারতে ১১ মে ৯৮ সালে শুভ বৈশাখী পূর্ণিমাতেই (যে দিনটিতে গৌতম বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ, মৃত্যু তথা পরিনির্বাণ লাভ) ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারের প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ি তিনটি এবং ১৩মে দুইটি মোট পাঁচটি পারমাণবিক বোমা রাজস্থানের পোখরানে সাফল্যজনকভাবে বিস্ফোরণের ঘোষণা দেন। অবশ্য ১৯৭৪ সালের ১৮ মে শুভ বৈশাখী পূর্ণিমাতেই প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর সরকার একই জায়গায় পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। সেই সময় পরীক্ষা সফল হওয়ার পরে ইন্দিরা গান্ধীর কাছে সাংকেতিক কোডে সাংকেতিক প্রেরণ করা হয়েছিল, 'The Buddha is smiling'। এরই প্রতিক্রিয়া হিসেবে পাকিস্তান ২৮মে ৯৮ সালে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় বেলুচিস্তান প্রদেশের চাসাই মরু এলাকায় ৫টি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। উভয় দেশের এই ঘটনায় জাপান তার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে এবং মঞ্জুরি সহায়তা বাতিল করে দেয়।[৯]

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সাথে জাপানের সম্পর্ক জাপানী নীতি নির্ধারকদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ১৩০ কোটির অধিক লোকসংখ্যার দক্ষিণ এশিয়ার বাজার জাপানী ব্যবসায়ীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া এই অঞ্চলে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক প্রচুর এবং বেতনের হারও খুব নিম্ন। সরকার বেসরকারি খাতকে উৎসাহ দিচ্ছে এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য নীতিমালা অনেক সহজ করেছে। কাজেই দক্ষিণ এশিয়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি জাপানী উদ্যোক্তাদের পছন্দের এলাকা হতে পারে। এলাকাকেন্দ্রীক শিল্প স্থানীয় চাহিদাও মেটাতে পারবে। স্থানীয়ভাবে জাপানী উদ্যোক্তারা কাঁচামালও ব্যবহার করতে পারবে। এই অঞ্চলে চীনা পণ্যের প্রসার জাপানীদের জন্য চিন্তার কারণ। সামরিক কৌশলগত দিক থেকেও জাপানী প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের কাছে দক্ষিণ এশিয়ার গুরুত্ব রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সাথে চীনের সীমান্ত রয়েছে। এ বিষয়টিও জাপানী নীতি-নির্ধারকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। 'জাপান তার সংগৃহীত এনার্জির শতকরা ৫০ ভাগ পারস্য উপসাগর এলাকা থেকে সংগ্রহ করে যা ভারত মহাসাগরের পাশ দিয়ে জাপানে পৌঁছায়।'[১০] কাজেই দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতিশীলতা তার জন্য একান্তই প্রয়োজন।

সার্কের বিষয়ে জাপানের দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়টিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ১৯৮৭ সালের আগষ্টে, ঢাকায় প্রদত্ত এক ভাষণে জাপানের তদানীন্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কুরানারী এ প্রসঙ্গে বলেন, 'জাপানী নীতির প্রধান স্তম্ভই হচ্ছে, সার্কের প্রতি অব্যাহত সমর্থন। এই সমর্থন কেবল অর্থনৈতিক নয় বরং আরো তাৎপর্যপূর্ণভাবে রাজনৈতিক বটে।'[১১] জাপান জাতীয় ও আঞ্চলিক ঐকমত্য এবং উদ্যোগ ও ঐকমত্যের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করে। যদি আঞ্চলিক সহযোগিতা, অঞ্চল বহির্ভূত দেশগুলোর সঙ্গে ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয় তখন তা আরো গঠনমূলক হয়। জাপান আসিয়ানের মতো অন্যান্য আঞ্চলিক সহযোগিতা ফোরামের সঙ্গে সার্কের কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনের পরামর্শ দেয়। উল্লেখ্য আসিয়ানও জাপানী প্রভাব বলয়ভুক্ত অন্যতম একটি অঞ্চল। বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক জোট গঠনের যে প্রবণতা তার প্রেক্ষাপটে সার্কের প্রতি জাপানের সমর্থন একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিককেই তুলে ধরে। প্রশান্ত মহাসাগর বেষ্টিত বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি ও ঋণদাতা দেশটির

পক্ষ থেকে অর্থনৈতিক সহযোগিতার আশ্বাসের মূল্য অপরিসীম। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর সঙ্গে সার্কের যোগাযোগ সারা দক্ষিণ এশিয়া বিশেষত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের চাবিকাঠি। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে সাম্প্রতিক বিশ্বের জাতীয়তাবাদী চেতনা উন্মেষের ধারণা 'বিশ্ব মঙ্গোলীয়' বা 'বিশ্ব বৌদ্ধ পুনরুত্থান' (Pan-Mongolian or Pan Buddhist Revivalism) এর আওতায় এবং প্রকৃত অর্থে অদূর ভবিষ্যতে পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলসমূহে স্বীয় স্বার্থ বজায় রাখতেই জাপানের এই সচেতনতা।

বাংলাদেশ-জাপান সম্পর্কের শেকড় ঐতিহাসিকভাবে অনেক গভীরে। বৌদ্ধ মতবাদের জন্মস্থানের নিকটে বাংলাদেশের অবস্থান এবং ভগবান বুদ্ধের বোধিলাভের সমভূমিটির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ জাপানীদের কাছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে শ্রদ্ধার স্থান। ১৯৭৬ সালে জেনারেল ফুজিয়ারা কর্তৃক ব্রহ্মপুত্র তীরের সমৃদ্ধ পুণ্যভূমি সফর এরই নিদর্শন। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অংশগ্রহণকে জাপান সমর্থন করে। এ বিষয়ে উভয় দেশের দৃষ্টিভঙ্গি এক। জাতিসংঘের বিভিন্ন শান্তিরক্ষী বাহিনীতে যোগ দিয়েছে জাপান। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে, 'সাবালক' হয়ে ওঠা জাপানের জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী আসনে জয়লাভ সেদেশের পররাষ্ট্রনীতির সাফল্যকেই তুলে ধরে। ভারত ও অষ্ট্রেলিয়াকে অস্থায়ী আসন লাভের প্রতিযোগিতায় পিছনে ফেলে ১৯৯৬-র ২৩ অক্টোবর জাপান নির্বাচিত হয়। ১৯৯৭-র ১লা জানুয়ারী থেকে দু'বছরের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের উত্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ে জাপান নিজেদের বক্তব্য পেশ করে। স্থায়ী পাঁচটি দেশের মতো ভেটো দেবার চরম ক্ষমতা না থাকলেও জাতিসংঘের মতো সর্বোচ্চ বিশ্বসংস্থায় জাপান জাতিসংঘ সংস্কারের কথা বলেছে। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে জাপান তৎপর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় জোর লবিং চালাচ্ছে তারা। জাপান উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্ব হতে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী ও অস্থায়ী সদস্য পদ বৃদ্ধির পক্ষপাতী। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ মনে করে জাতিসংঘকে আরো গণতান্ত্রিক ও স্বচ্ছ হতে হবে। বাংলাদেশ জাপানীদের ধারণাকে সমর্থন করে। পরমাণু অস্ত্রের প্রয়োগের বাস্তব অভিজ্ঞতা জাপানের আছে। জাপান তার বিদেশনীতির তত্ত্বগত দিকের যে ব্যাখ্যা করেছে, তার প্রধান বিষয়বস্তুই হল গোটা বিশ্বকে পরমাণু অস্ত্রের বিভীষিকার হাত থেকে রক্ষা করা। বাংলাদেশ সিটিবিটিকে অনুমোদন করেছে। বাংলাদেশ সফরকালে জাপানী প্রধানমন্ত্রী মোরি বলেন, 'Bangladesh's ratificaition of the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, and its energetic role as the prosper of the South Asian Association for Regional Cooperation.[১২]

নিম্নে বাংলাদেশ-জাপান সম্পর্কের রাজনৈতিক প্রেক্ষিতটি বিভিন্ন সরকারের সময়ের প্রেক্ষিতে আলোচনা করা হয়েছে:

ক) ১৯৭২-১৯৭৫

দক্ষিণ এশিয়ায় (বাংলাদেশসহ) সোভিয়েত কৌশল ছিল এ অঞ্চলে চীন ও আমেরিকার প্রভাব ক্ষুণ্ন করা। অন্যদিকে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব ঠিক তার বিপরীত ছিল। স্নায়ুযুদ্ধকালীন সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্টের দ্বন্দ্ব সারা বিশ্বকে প্রায় দুই

শিবিরের প্রভাব বলয়ে বিভক্ত করে ফেলেছিল। জাপান এ সময়ে বিশ্ব রাজনীতি থেকে দূরে থাকায় দক্ষিণ এশিয়ায় এ বিষয়ে নিজেদেরকে জড়াতে চায়নি। তাদের মনোনিবেশ ছিল অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে। কৌশলগত কারণে তাদের মনোযোগ অধিক পরিলক্ষিত হয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির রূপরেখা কি হবে তা নিয়ে বিশ্ববাসীর তথা বাংলাদেশের জনগণের যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল। বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমান প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশকে 'সুইজারল্যান্ডের মত গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেন।[১৩] কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ব্যাপারে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার কারণে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ দুটি দেশের সাথে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যা যুক্তরাষ্ট্র বা চীন কেউ স্বাভাবিকভাবে নেয়নি। তারা এ এলাকায় তাদের 'কর্তৃত্ব পরিত্যাগ' করতে রাজি ছিল না।[১৪] তবুও লক্ষণীয় ১৯৭১ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ-জাপান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গড়ে উঠে পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে। এই সময়ে দুটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একটি হচ্ছে জাপানের কাছ থেকে বাংলাদেশের স্বীকৃতি এবং অন্যটি জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভে জাপানের সমর্থন।

পাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময় বন্দী থাকার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে আসেন ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২। ঐদিনই জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী তাকেও ফুকুদা ঢাকায় জাপানের কনসাল জেনারেল মাসাতাদা হিজাকির (Masatada Hegaki) মাধ্যমে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানায় জাপান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। জাপান হচ্ছে ৩১তম দেশ যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ঐ একই দিন কিউবাও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল।[১৫] একইসাথে জাপানের প্রধানমন্ত্রী সাতো পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জুলফিকার আলী ভুট্টোকে জানায়, 'জাপান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং পাকিস্তানের প্রতি জাপানের নীতি অপরিবর্তিত থাকবে।'[১৬] মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার দুই মাসের মধ্যে ঐ স্বীকৃতি অনেকের কাছেই বিভ্রান্তিকর বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আমরা যদি মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন-চীন সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ প্রক্রিয়া ও তা থেকে জাপানকে আড়ালে রাখার বিষয়ে আলোকপাত করি তাহলে বিষয়টি পরিস্কার হবে। এই স্বাভাবিকিকরণ প্রক্রিয়ায় জাপানের আপত্তির কিছু ছিল না কিন্তু জাপান আশা করেছিল পূর্ব এশিয়ার ঘনিষ্ট মিত্র হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে বিষয়টি অবহিত করবে। বিষয়টি জাপানী নীতি-নির্ধারকদের হয়তো ভাবিয়ে তোলে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জাপানের মত প্রকাশের প্রয়োজনীয়তাকে সামনে তুলে ধরে। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় সে সুযোগকেই জাপানের সামনে তুলে ধরে। বিশ্বের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি আসে জাপানের কাছ থেকেই। পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে ১০ নভেম্বর, ১৯৭৪। নিরাপত্তা পরিষদে জাপানসহ ১১টি দেশের প্রতিনিধিগণ বাংলাদেশের পক্ষে ভোট দেয়।

খ) ১৯৭৬-১৯৮১

১৯৭৫ এর ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এ সময়

বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন ধারায় প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ক্ষমতায় আসেন মোশতাক আহমদ। তিনি ভারত-সোভিয়েত অক্ষ থেকে বের হয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাতে চাচ্ছিলেন। সৌদি আরব, চীন নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। এ সব স্বীকৃতিতে সরকারের আগ্রহের ধরন থেকে এটা বোঝা যায় যে, বাংলাদেশ ধীরে ধীরে ভারত-সোভিয়েত অক্ষ থেকে বের হয়ে আসছে।[১৭] অন্যদিকে জাপান সরকারের এ ঘটনায় নীরবতা পালন করে। তারা কোন মতামত ব্যক্ত করার চেয়ে নীরব থাকাকেই শ্রেয় মনে করে। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালের ৬ই নভেম্বর ক্ষমতায় আসেন বিচারপতি এ এস এম সায়েম এবং সামরিক বাহিনীর প্রধান হিসেবে থাকেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। এ সময় ১৯৭৬ সালের মার্চে একটি জাপানি প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে ঢাকায় আসেন মি. তাকাশি হায়াকাওয়া (Takashi Hayakawa)। তিনি বলেন, "আগষ্টের পরিবর্তনের পর এখন কোন রাজনৈতিক শূন্যতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।"[১৮] এই উক্তিতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, জাপান বাংলাদেশের অস্থিতিশীল পরিবেশকে মেনে নিয়েছিল এবং নতুন সরকারের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার অভিপ্রায় নিয়েই তিনি এদেশে এসেছিলেন। ১৯৭৭ সালের ২১শে জুলাই জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতা গ্রহণ করেন। বাংলাদেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর নতুন সরকারের সামনে বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে সকল সমস্যা দেখা দেয়, জাপান সরকার সেক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে শান্তি স্থিতিশীলতা রক্ষার প্রশ্নে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে। জাপান এই অঞ্চলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়। বাংলাদেশের সঙ্গে জাপান পূর্বের ধারাবাহিকতায় পারস্পরিক সম্পর্ক বিকাশেই অধিকতর মনোযোগী ছিল। ১৯৭৭ সালের ১৭ই জুলাই জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি. ইচিরো হাতোয়ামা (Ichiro Hateyama) বাংলাদেশে আসেন। বাংলাদেশে কোন জাপানী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এটিই ছিল প্রথম সফর। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জাপানের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও দু'জন পার্লামেন্ট সদস্যসহ মোট ২০ জন সদস্য। তিনি রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এই অঞ্চলে শান্তি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না থাকলে কোন অবস্থাতেই যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়, এ বিষয়ে তাঁরা উভয়ই মত প্রকাশ করেন। বাংলাদেশসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশের সাথে সহযোগিতার প্রশ্নে জাপান শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য কাজ করাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বলে মনে করে। সাংবাদিকরা উপমহাদেশের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে জাপানের সম্পর্কের পুনরুজ্জীবন বলতে কি বোঝায় জিজ্ঞাসা করলে মি. হাতোয়ামা উত্তরে জানান "আমরা মনে করি এশিয়ার শান্তি ও স্থিতিশীলতার সাথে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনার সম্পর্ক রয়েছে।"[১৯] তিনি আরও বলেন, "উন্নয়ন কর্মসূচির দ্রুত ও সফল বাস্তবায়নের জন্য নিরবচ্ছিন্ন আঞ্চলিক শান্তি ও নিরাপত্তা যে একান্ত অপরিহার্য তাতে দ্বিমতের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। এশিয়ার আঞ্চলিক শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়োজনীয়তার উপর বাংলাদেশ সবসময় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। শান্তি, সম্প্রীতি, নিরাপত্তা ও অগ্রগতি সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সম্প্রসারণবাদী ও অধিপত্যবাদী তৎপরতা এবং অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বন্ধ করার বলিষ্ট আহ্বান জানিয়েছিল বাংলাদেশ। ফারাক্কা ইস্যু নিয়ে বাংলাদেশের সাথে ভারতের বিরোধের বিষয়ে মি. হাতোয়ামা ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলবেন বলে

জানান। মি. হাতোয়ামা বলেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারি খাতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বের সরকারের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়করণ নীতি পরিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান সরকারের বেসরকারি খাতের উন্নয়নকে তিনি স্বাগত জানান।

পারস্পরিক রাজনৈতিক সম্পর্ক বিকাশের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ১৯৭৮ সালের ৬ই এপ্রিল প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান চারদিনের রাষ্ট্রীয় সফরে টোকিও যান। সফরের পূর্বে বাংলাদেশের পত্রপত্রিকায় মন্তব্য করা হয় যে, প্রেসিডেন্ট এমন এক সময় জাপান সফরে যান, যখন জাপান পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ত্রিমুখী নীতি গ্রহণ করেছিল। জাপান একই সাথে যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে চলছিল। জাপান তার এলাকায় কোন রকম উত্তেজনা পছন্দ করে না। তাঁরা মনে করেন শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি যে কোন উন্নতির সহায়ক।২০ সফরকালে প্রেসিডেন্ট জিয়া ও প্রধানমন্ত্রী তাকেও ফুকুদা (Takeo Fukuda) পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের প্রশ্নে বলেন, আজকের বিশ্ব-পরিস্থিতি পরস্পর নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক সমাজে বিশ্ব শান্তি ও সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ন রাখা ও তার উন্নয়নে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে শান্তি ও সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলা একান্ত অপরিহার্য। উভয়ই মনে করেন, বিশ্বশান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় রাখার প্রয়োজনেই এশিয়ায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা এবং এতদঞ্চলের সমৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের গঠনমূলক প্রচেষ্টায়, নিজ নিজ সরকারের সহযোগিতা প্রদানের সংকল্পের কথা বলেন। জাপানী প্রধানমন্ত্রী বলেন, "জাপান ও এশিয়ার অন্যান্য জাতি প্রতিবেশী রাষ্ট্র এবং প্রত্যেকেই এই অঞ্চলের শান্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জনের অংশীদার।" তিনি দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর সাথে ঐতিহ্যগত মৈত্রী ও সহযোগিতার সম্পর্ক সুদৃঢ় করার ব্যাপারে জাপান সরকারের সংকল্পের কথা ঘোষণা করেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নিজ দেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরেন এবং জোট নিরপেক্ষ নীতিতে বাংলাদেশের অঙ্গীকারের কথা পুনরায় ব্যক্ত করেন। সার্বভৌমত্ব, সমতা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতির ভিত্তিতে বিশ্বের সকল দেশের সাথে তাঁর দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কোন্নয়নের সদিচ্ছার কথা প্রকাশ করেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়া ও প্রধানমন্ত্রী ফুকুদা মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি নিয়েও পর্যালোচনা করেন। তাঁরা আশা প্রকাশ করেন, 'নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২ ও ৩৩৮ নম্বর প্রস্তাব ত্বরিত ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং জাতিসংঘ সনদ মোতাবেক প্যালেস্টাইনী জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার মেনে নেয়ার মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে ন্যায় ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।[২১] দুই দেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী বিশ্বশান্তি বজায় রাখা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা উন্নয়নে জাতিসংঘের পালিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উলে-খ করেন এবং জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ফোরামে দুদেশের সরকারের মধ্যে অব্যাহত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রী বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সংস্থার উন্নয়নশীল দেশগুলোর সমস্যা ও আশা আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরার ব্যাপারে বাংলাদেশ যে কার্যকর ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে এজন্য তাঁকে অভিনন্দিত করেন। প্রেসিডেন্ট জিয়া জাতিসংঘের লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অব্যাহত রাখার প্রশ্নে জাপানের দৃঢ় সংকল্পের প্রশংসা করেন। নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তির প্রশ্নে

উভয় পক্ষই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখার জন্য মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে অগ্রগতি। প্রেসিডেন্ট জিয়া ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরকে শান্তির এলাকায় পরিণত করার জন্য জাতিসংঘ প্রস্তাব বাস্তবায়নে উপকূলীয় ও পশ্চাদভূমির সকল দেশের বৈঠকের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেন। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, এই অঞ্চলে অস্ত্র উৎপাদন হ্রাস এবং সেই সঙ্গে বিশ্বের সকল অংশে পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টা চালানো হলে তা হবে এই লক্ষ্যে একটি অগ্রণী পদক্ষেপ।[২২] তাঁরা উত্তর-দক্ষিণ আলোচনার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব-আরোপ করেন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বিশ্বশান্তি উন্নয়নের স্বার্থেই দু'পক্ষের মধ্যে বিবদমান সমস্যাগুলোর ত্বরিত সমাধানের অনিবার্যতার কথা উলে-খ করেন। এ প্রসঙ্গে জাপানের প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাণিজ্য ও পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে বাস্তব ও সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণের বেলায় জাপান অন্যান্য দেশের সাথে আন্ত রিক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং ব্যবস্থাগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালাবে। উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট জিয়ার এই টোকিও সফরের গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ ছিল, উভয় দেশের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠান। দুটি দেশের সম্পর্কোন্নয়নে এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত বিষয়ে মত বিনিময় ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে প্রস্তাবিত মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকগুলোতে। এছাড়া দু'দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য একটি যৌথ কমিশন গঠনেরও সুপারিশ করা হয়। বাংলাদেশ ও জাপান ১৯৭৮ সালে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য পদে নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এতে বাংলাদেশ জয়ী হয়। দুই দেশের সম্পর্ক যাতে ক্ষুণ্ন না হয় সেজন্য নির্বাচনের পূর্বে জাপানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব মোস্তফা কামাল বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক শামসুল হকের একটি পত্র জাপানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি. সোনোদার (Sonoda) কাছে হস্তান্তর করেন।[২৩] পত্রে বলা হয়, বাংলাদেশ জাপানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো জোরদার করার জন্য কাজ করে যাবে এবং পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে সহযোগিতা করবে। জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, নির্বাচনের ফলাফল দুটি দেশের মধ্যে সামান্যতম প্রতিকূল প্রভাব ফেলবে না। এতে প্রতীয়মান হয়, বিষয়টি জাপান স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিয়েছিল এবং বাংলাদেশ সংকট কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিল। বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করলেও বাংলাদেশ-জাপান রাজনৈতিক সম্পর্ক বিঘ্নিত হয়নি। এছাড়া ভিয়েতনামী সেনাবাহিনী কর্তৃক কম্পুচিয়ায় এবং আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর প্রবেশের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ও জাপানের অবস্থান এক ছিল।

গ) ১৯৮২-১৯৯০

সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর ১৯৮১ সালের ৩১ মে ক্ষমতায় আসীন হন বিচারপতি আবদুস সাত্তার। এই সময়ে বাংলাদেশ সফরে আসেন জাপান-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতির চেয়ারম্যান তাকাশি হায়াকাওয়া। তিনি নতুন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তারের কাছে জাপানের প্রধানমন্ত্রী সুজুকির একটি বার্তা পৌঁছে দেন। তিনি মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং বেগম

জিয়ার সাথে দেখা করেন। ধারণা করা যায়, জাপানের প্রধানমন্ত্রীর বার্তাবাহী এই প্রতিনিধি বাংলাদেশে ঐ সময়ে অস্থিতিশীল অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্যই মূলত এখানে আসেন। লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতায় আসীন হন ১৯৮৩ সালের ১০ই ডিসেম্বর। তিনি পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে জিয়াউর রহমানের গৃহীত নীতি অব্যাহত রাখেন। রাষ্ট্রপতি এরশাদের সময়ে নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের পক্ষে জাপানের সমর্থন আদায়, সার্ক ও উপসাগরীয় সংকটের বিষয়গুলো প্রাধান্য লাভ করেছিল। ১৯৮৮ সালে নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদে বাংলাদেশের পক্ষে জাপানের সমর্থন আদায়ের জন্য জাপান গমন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী। জাপানী প্রধানমন্ত্রী মি. ইয়ামুহিরো নাকাসোন পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানান, জাপান বাংলাদেশের প্রার্থীকে সমর্থন দিবে। অবশ্য সেবার বাংলাদেশ সদস্যপদ লাভে ব্যর্থ হয়েছিল।

১৯৮৭ সালের ১৩ই আগষ্ট তিন দিনের সরকারি সফরে জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাদাশী কুরানারী (Tadashi Kuranari) বাংলাদেশে আসেন। তিনি রাষ্ট্রপতি এইচ.এম. এরশাদ, উপ-রাষ্ট্রপতি জনাব নুরুল ইসলাম, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন। আন্ত র্জাতিক ইন্সটিটিউট অব স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ আয়োজিত এক সেমিনারেও তিনি বক্তব্য রাখেন।[২৪] জাপান সাত জাতি দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সমিতিকে (সার্ক) শক্তিশালী করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল।[২৫] বাংলাদেশ সফরের পূর্বে জাপানী প্রতিনিধিদল ভারত সফর করেছিলেন। সেখানে জাপানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাদাশী কুরানারী ভারতের পররাষ্ট্রবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী নটবর সিং এর সাথে আলোচনাকালে সার্ককে সহযোগিতা করার কথা বলেন এবং জাপান সার্ককে খুবই গুরুত্ব দেয় এবং সার্কের অর্থনৈতিক ও অসামরিক তৎপরতায় সহযোগিতা দিতে আগ্রহী বলে জানানো হয়। দ্বিপক্ষীয় ভিত্তিতে জাপানের সাহায্য অব্যাহত থাকবে এবং সাহায্যের প্রস্তাবটি গৃহীত হবার আগে সার্কভুক্ত সাতটি দেশে তা নিয়ে আলোচনা হবে বলেও মুখপাত্র উল্লেখ করেন।[২৬] উল্লেখ্য সার্ক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলো হচ্ছে আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্র, টেলিযোগাযোগ ও পরিবহন গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন এবং একটি অভিন্ন সম্প্রচার কর্মসূচি বাস্তবায়ন। বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত 'দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক, শীর্ষক সেমিনারে জাপানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তাঁর দেশ দক্ষিণ এশিয়ায় উন্নয়নের জন্য অব্যাহত সহযোগিতা দেবে। তবে এটা নির্ভর করছে সার্কের সফলতার উপর। দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা, সমঝোতা বৃদ্ধি এবং পারস্পরিক স্বার্থ সংক্রান্ত সহযোগিতা বিস্তার, এই তিনটি নীতি বা পিলারের মাধ্যমে নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হবে বলে তিনি উলে-খ করেন।[২৭] দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর সঙ্গে জাপানের বর্তমান সম্পর্ক আরও নিবিড় ও প্রসারিত হওয়ার প্রয়োজন বলে উলে-খ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। সার্কের চেতনা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য বাংলাদেশের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে আলাপকালে দ্বিপাক্ষিক বিষয় ছাড়াও ইরান-ইরাক যুদ্ধ, আফগানিস্তান, কম্পুচিয়া ইস্যু আলোচনায় স্থান পায়।

১৯৯০ সালের ১লা মে জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোশিকি কাইফু ও মিসেস শাচিও কাইফু

দু'দিনের সফরে ঢাকা আসেন।[২৮] পাঁচটি দেশ সফর কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি বাংলাদেশে আসেন। কোন জাপানী প্রধানমন্ত্রীর এটিই প্রথম বাংলাদেশ সফর। বাংলাদেশ সরকারের সাথে জাপানী প্রধানমন্ত্রীর আলোচনায় যমুনা সেতু এবং বিনিয়োগ প্রসঙ্গ স্থান পায়। ১৯৯০ সালের ১১ই নভেম্বর রাষ্ট্রপতি এরশাদ তৃতীয় বার টোকিও সফর করেন নতুন সম্রাট আকিহিতোর সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য। এতে আরও ৫০টি দেশের প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতি এরশাদ, প্রধানমন্ত্রী কাইফুর সাথে বৈঠকে মিলিত হন। প্রধানমন্ত্রী কাইফু উপসাগর সংকট প্রশ্নে বাংলাদেশের ভূমিকার প্রশংসা করে বলেন, সৌদি আরবে বাংলাদেশ সৈন্য প্রেরণে সৌদি আরব ও অন্যান্য দেশের নিরাপত্তা জোরদার হয়েছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে বাংলাদেশ ও জাপানের অবস্থান এক। রাষ্ট্রপতি এরশাদ উপসাগর সংকটের কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যে বিশাল প্রভাব পড়েছে এবং এই পরিস্থিতি মোকাবেলা গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে জাপানী প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন। রাষ্ট্রপতি ও বেগম রওশন এরশাদের সম্মানে আয়োজিত যৌথ সম্বর্ধনায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেন যে, 'উপসাগর, কম্পুচিয়া ও আফগানিস্তান পরিস্থিতি প্রশ্নে উভয় দেশের রয়েছে সমদৃষ্টিভঙ্গি এবং এটি স্বীকৃত নীতিমালায় প্রতিষ্ঠিত। ইরাক ও কুয়েতে আটকে পড়া বাংলাদেশীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করার জন্য তিনি জাপান সরকারকে ধন্যবাদ জানান। তিনি প্রয়াত তাকাশি হায়াকাওয়ার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁকে জাপান-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতির জনক বলে অভিহিত করেন।[২৯]

ঘ) ১৯৯১-১৯৯৫

১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে জেনারেল এরশাদের পতন ঘটে। বিচারপতি (অবঃ) সাহাবুদ্দিন আহমেদ -এর নেতৃত্বে নতুন নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হয়। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরুর ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে জাপানের গভীর আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। এই পটভূমিতে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য হিরোইচি ফুকুদার নেতৃত্বে ছয় সদস্যের এক জাপানী প্রতিনিধিদল ১৯৯১ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় আসেন। প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে বলা হয় 'এশিয়ার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া জোরদারে সহযোগিতা করা জাপানের প্রতিষ্ঠিত নীতি।[৩০] প্রতিনিধিদল ঢাকা ও ময়মনসিংহের বিভিন্ন ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। ফুকুদা নির্বাচন-পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে নির্বাচন অত্যন্ত সুষ্ঠ, শান্তিপূর্ণ ও পক্ষপাতহীনভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং বাংলাদেশে গণতন্ত্র উত্তরণের এই প্রক্রিয়ায় তারা আনন্দিত ও আশাবাদী বলে মন্তব্য করেন। ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি) ক্ষমতায় আসে। নতুন সরকারের পররাষ্ট্রনীতির ধারণা তার নির্বাচনী ইশতেহার থেকে পাওয়া যায়। নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়, জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ এবং সকল রাষ্ট্রের সাথে সার্বভৌম ক্ষমতার ভিত্তিতে সহযোগিতামূলক বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলা হবে। প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে সমতাভিত্তিক সুসম্পর্ক ও মুসলিম দেশসমূহের

সাথে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন অব্যাহতভাবে অনুসরণ করা হবে। আধিপত্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ এবং এক রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সক্রিয় নীতি অব্যাহত রাখা হবে। বিশ্বের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের নিরাপত্তা বিধান এবং জাতিসংঘের কাঠামোগত সংস্কার সাধনের জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হবে। বিশ্বশান্তি রক্ষায় অবিচলভাবে কাজ করা হবে। জাতিসংঘের আহ্বানে শান্তিরক্ষার কাজে বিশ্বের যে কোন স্থানে প্রতিরক্ষা বাহিনী পাঠানো হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক কূটনীতির উপর জোর দেয়া এবং এই সময়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিভিন্ন নদ-নদীর পানি বণ্টন নিয়ে সম্পর্ক শিথিল হতে থাকে। বিষয়টি বাংলাদেশ ও জাপানের রাজনৈতিক আলোচনায় উঠে আসে। বেগম জিয়া তাঁর জাপান সফরের সময় জানান, গঙ্গা ও তিস্তার পানি প্রবাহের ন্যায্য হিস্যা ভারতের কাছ থেকে আদায় করতে বাংলাদেশ গুরুতর প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে। উল্লেখ্য বাংলাদেশের ২৩০টি নদ-নদীর মধ্যে ৫৪টি বড় নদী ভারত থেকে এসেছে। 'বেগম জিয়ার সময় গঙ্গার পানি নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্য কোন চুক্তি না থাকায় ভারত এসব নদী থেকে একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহার করে। ফলে, দেশের উত্তরাঞ্চলে মরুকরণ দেখা দেয় এবং দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়। গঙ্গার উপর ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের পর ভারত একে একে ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও বরাকসহ অভিন্ন নদীগুলোর প্রায় সবগুলোর উপর বাঁধ নির্মাণ করে। এতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য - এক কথায় বাংলাদেশের অর্থনীতি মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।[৩১] বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়া আশা প্রকাশ করে বলেন, জাপানের মত বন্ধু দেশগুলো পানির ব্যাপারে অমানবিক নীতি পরিত্যাগ করতে ভারতকে রাজি করানোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে এবং তিনি বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জাপান সরকার ও জনগণের উদার সহযোগিতা ও সমর্থনের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন।[৩২] নিরাপত্তা পরিষদে জাপানের স্থায়ী সদস্য পদ লাভের প্রচেষ্টার প্রতি বেগম জিয়া সরাসরি সমর্থন জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১১ থেকে ১৫ করা হয়েছে। কিন্তু স্থায়ী সদস্যের সংখ্যা আগের মতোই রয়ে গিয়েছে পাঁচ। এই পাঁচটি দেশ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স ও চীন। কিন্তু এখন পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে একক পরাশক্তির অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপটে অনেক দেশই এই ব্যবস্থায় খুশী নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত অক্ষশক্তি জাপান ও জার্মানী এখন নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে অনেকটা অপরাজেয় অর্থনৈতিক শক্তিরূপে। তাই তারাও ভেটো ক্ষমতাসহ স্থায়ী সদস্য পদের দাবিদার। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সংখ্যা বৃদ্ধির দাবিতে ৩৭টি দেশের পক্ষ হতে উত্থাপিত ভারতীয় প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয় সাধারণ পরিষদে। ভারতের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র (১৯৯৫ সালে) বলেছে, 'কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হলেই ভারতের দাবি বিবেচনা করা যেতে পারে। অন্যদিকে পাকিস্তানী প্রতিনিধি জনাব জামশেদ মার্কার (১৯৯৫ সালে) বলেন, জাপান ও ভারত ছাড়া আগ্রহী অন্যান্য দেশের বিষয়ও বিবেচনায় নেয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে তিনি পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ার নাম উল্লেখ করেন।[৩৩]

ঙ) ১৯৯৬-২০০১

১৯৯৬ সালের ১২ই জুন সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য জাপানের সাবেক প্রতিমন্ত্রী এবং তৎকালীন সংসদ সদস্য শিন শাকুরাইয়ের (Shin Sakurai) নেতৃত্বে নয় সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ঢাকায় আসেন। নির্বাচন-পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে 'ঢাকা ও কুমিল-ার দুটি নির্বাচনী এলাকা পরিদর্শন করে আমরা নিশ্চিত হয়েছি নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ হয়েছে' বলে তিনি উল্লেখ করেন।[৩৪] ১৯৯৬ সালের এই নির্বাচনে দীর্ঘ ২১ বছর পর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা লাভ করে। ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন তাঁর নেতৃত্বে ঐকমত্যের সরকার গঠিত হয়েছিল। শেখ হাসিনার সরকারের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় এই দলগুলোর কোনো প্রভাব ছিল না। আওয়ামী লীগ পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে নির্বাচনী ইশতেহারে[৩৫] বলে, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডতা সুরক্ষিত রাখা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করাই হবে পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য। জাতিসংঘ ও এর বিভিন্ন অঙ্গ প্রতিষ্ঠানে সক্রিয় ভূমিকা রাখার প্রয়াস গ্রহণ করা হবে। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, কমনওয়েলথ, মুসলিম রাষ্ট্র সম্মেলন (ওআইসি) এবং সার্কের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অর্থবহ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য আওয়ামী লীগ সচেষ্ট থাকবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা ও সুস্পর্কের ভিত্তিতে আঞ্চলিক সহযোগিতার কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার প্রয়াস গ্রহণ করা হবে। আওয়ামী লীগ সার্ক-এর প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করবে এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সার্ক এর কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে। বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রীচুক্তি নবায়ন না করা, দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে ফারাক্কা সমস্যার স্থায়ী সমাধান ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক নদীর পানি বণ্টনের প্রশ্নেও বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিতকরণ করা হবে।[৩৬] ভারতের সাথে গঙ্গার পানি চুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি এবং পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের বিষয়গুলো আলোচনায় প্রাধান্য পায়। ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর এ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ফারাক্কায় গঙ্গার পানি বণ্টন সংক্রান্ত ৩০ বছর মেয়াদী চুক্তি হয়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ ৪০ হাজার ও সর্বনিম্ন ৩৫ হাজার কিউসেক পানি পাবে। ফলে দীর্ঘদিনের চুক্তিহীনতার অবসান ঘটে।[৩৭] ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর মাধ্যমে শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র বিদ্রোহের অবসান ঘটে।[৩৮] প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের সাথে ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্কের বিষয়ে জাপানী প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন। উলে-খ্য, ১৯৯৮ সালে ভারত (১১-১৩ মে) দ্বিতীয় বারের মতো (প্রথমবার ১৯৭৪ সালে) ভূগর্ভে ৫টি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে পাকিস্তান (২৮মে, ১৯৯৮) সমসংখ্যক পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়। ফলে এই উপমহাদেশে ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দেয়। ১৯৯৬ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। এই চুক্তির মূলকথা হচ্ছে কোনো সদস্য রাষ্ট্রই কোন রকম পারমাণবিক পরীক্ষা, বিস্ফোরণ কিংবা অন্য কোন প্রকার পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাতে পারবে না এবং তার এলাকাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন অন্য যে কোন স্থানেও তা বন্ধ করতে হবে। ভারত ও পাকিস্তান কেউ এই চুক্তি স্বাক্ষর করেনি। স্বাক্ষর না করার পেছনে ভারতীয়দের যুক্তি হচ্ছে, চুক্তি করে বিশ্ব থেকে পারমাণবিক অস্ত্র

প্রতিযোগিতা রোধ করা যাবে না। অন্যদিকে পাকিস্তানের যুক্তি হচ্ছে, ভারত যেহেতু NPT বা CTBT চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি সেহেতু পাকিস্তান তার নিরাপত্তার প্রশ্নে এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাপানের প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাদেশে ১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত ত্রি-দেশীয় বাণিজ্য সম্মেলনের মত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। 'জানুয়ারী ১৫,' ৯৮-এ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় সর্বপ্রথম ত্রিদেশীয় শীর্ষ সম্মেলন। বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের তিন প্রধানমন্ত্রী ও শীর্ষ সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে এ দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিনিয়োগ প্রসার এবং সর্বোপরি আন্তঃআঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদারকরণের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার কথা বিশেষভাবে আলোচনা করেন।[৩৯] জাপানের পক্ষ থেকে জানানো হয় জাপান সার্কের কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করে এবং সার্ককে আরো কার্যকর করার জন্য জাপান-সার্ক বিশেষ ফান্ড গঠনের কথা জাপানী প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী মোরি জাতিসংঘের সংস্কারের কথা তুলে ধরেন এবং আশা প্রকাশ করেন জাতিসংঘের মিলেনিয়াম অধিবেশনে জাপান এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুলে ধরবে। তিনি আরো বলেন, নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী ও অস্থায়ী সদস্য বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতিসংঘ আরো কার্যকরি ভূমিকা পালন করতে পারবে। তিনি উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশ থেকে স্থায়ী সদস্য নেয়ার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ বিষয়ের প্রতি তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করে বলেন, মিলেনিয়াম অধিবেশনের বক্তব্য তৈরী করার সময় তিনি এই বিষয়টি বিবেচনায় রাখবেন। প্রধানমন্ত্রী শান্তির জন্য এশিয়ান পার্লামেন্ট এসোসিয়েশন-এ (Association of Asian Parliaments for Peace-AAPP) জাপানের অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। জাপানী প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি উভয় কক্ষের সদস্যদের জানাবেন বলেও উলে-খ করেন।[৪০]

চ) ২০০১-২০০২

২০০১ সালের ১লা অক্টোবর নির্বাচনে চারদলীয় ঐক্যজোটের সরকার ক্ষমতায় আসে। বি.এন.পি-র সাথে ক্ষমতায় আসে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ঐক্যজোট, জাতীয় পার্টির (নাজিউর) একাংশ। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বি.এন.পি তার পূর্বের ধারা (৯১-৯৬) অব্যাহত রাখে। সরকার পরিবর্তনের পর বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ডঃ আব্দুল মঈন খান ২০০১ সালের নভেম্বরে টোকিও সফর করেন। তিনি বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও জাপানের রেডিও চ্যানেল এন.এইচ.কে (N.H.K) এর মধ্যে সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করেন। তথ্যমন্ত্রী শিক্ষামূলক টিভি অনুষ্ঠান, বাংলাদেশ রেডিওর এফ. এম (FM) কার্যক্ষমতা বাড়ানোসহ অন্যান্য বিষয়ে এন.এইচ.কে'র সহযোগিতা চান। ডঃ খান এন.এইচ.কে'র বাংলা ষ্টুডিও ও অন্যান্য সুবিধাদি ঘুরে দেখেন। তথ্যমন্ত্রী জাপানে, উন্নয়ন সহযোগিতা ও পার্টনারশীপ' বিষয়ে আফ্রো-এশিয়ান পার্লামেন্টারিয়ান মিটিং ও এশিয়া-প্যাসিফিকে দুর্নীতি বিষয়ক তৃতীয় বার্ষিক কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তথ্যমন্ত্রী দ্বিবার্ষিক সহযোগিতা বিষয়ে জাপানের হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভের স্পীকার তামিসুকে ওয়াটানুকির (Tamisuke Watanuki) সাথে আলোচনা করেছিলেন। স্পীকার, বেগম খালেদা জিয়াকে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার জন্য অভিনন্দিত করেন। ডঃ মঈন খান ২০০২ সালে দুই দেশের সম্পর্কের ত্রিশবছর

পূর্তি জাঁকজমকভাবে পালনের জন্য প্রস্তুতির বিষয় অবহিত করেন। তিনি দুই দেশের পার্লামেন্টারিয়ানদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। দুই দেশের মধ্যে গঠিত পার্লামেন্টারী ফ্রেন্ডশীপ এসোসিয়েশন আরো শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তার সহযোগিতার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।[৪১] ২০০২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও জাপান কূটনৈতিক সম্পর্কের ত্রিশ বছর পূর্তি হয়। বাংলাদেশে জাপানী দূতাবাস 'Japan Month' নামে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। দুই দেশের পক্ষ থেকেই আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে কূটনৈতিক সম্পর্কের ত্রিশ বছর উদযাপিত হয়।

উপসংহার

বাংলাদেশ-জাপান কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্কের বিকাশমান ধারা লক্ষণীয়। বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তন এই অব্যহত ধারাকে ব্যহত করেনি বরং দুই দেশের সরকারি পর্যায়ে প্রতিনিধি বিনিময়, শুভেচ্ছা, বার্তা বিনিময়, মত বিনিময়, সাহায্য ও সমর্থনের বিষয়াদি দ্বিপাক্ষিক রাজনৈতিক সম্পর্কের গুরুত্বকেই তুলে ধরেছে। জাতীয় ও পারস্পরিক স্বার্থের বিষয়টি দুই দেশের রাজনৈতিক সম্পর্কের মূল বিষয় হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। বিগত তিন দশকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে উপর্যুপরি পালাবদল ঘটলেও জাপানের সাথে আমাদের সম্পর্ককে তা প্রভাবিত করতে পারেনি। বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দানের পর থেকেই আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জাপান সক্রিয় সহযোগিতা দিতে শুরু করে এবং সেই পথ ধরেই এই অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিষয়টি পরবর্তী সময়ে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়।[৪২] বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা নিরস্ত্রীকরণসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যু, যেমন, ভিয়েতনাম, আফগানিস্তান, কম্পুচিয়া, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীতে অংশগ্রহণ, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার ইত্যাদিতে অভিন্ন অবস্থান দুটি দেশকে আরো ঘনিষ্ঠ করে তুলেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি নিরাপত্তা ও পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে এবং স্বনির্ভর জাতীয় অর্থনৈতিক বিকাশের প্রশ্নে বাংলাদেশ-জাপান রাজনৈতিক সম্পর্ক ক্রম বিকাশমান। তবে, বাংলাদেশ-জাপান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক মাত্রাতিরিক্ত পর্যায়ে গ্রহীতা-দাতা সম্পর্কে পরিণত হওয়ায় ঘনিষ্ঠ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ইতিবাচক প্রাপ্তি হতে বাংলাদেশ অনেকাংশে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যুসমূহ অর্থনৈতিক বিষয়ের পিছনে পড়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশকে তাই বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠে, অভ্যন্তরীণ সম্পদের উপর অধিক মনোযোগ দিতে হবে। মনে রাখতে হবে কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ ছাড়াই জাপান বিশ্বে আজকের এই অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে জাপানীদের একাগ্রতা ও অভিজ্ঞতা বাংলাদেশকে কাজে লাগাতে হবে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা বিষয়ে জাপানীদের মনে যে শঙ্কা বিরাজমান, তা কাটানোর দায়িত্বও বাংলাদেশকেই নিতে হবে।

তথ্যসূত্র

১. Padel Ford, et, al, the Dynamics of International Politics, New York, Mqcmillan Publication Co. 1976, p.120

২. F.S Northedge 'The Nature of Foreign Policy' in The Foreign Policy of the Powers, London, Faber and Faber, 1962, p.16.

৩. আজাদ, ১৭ অক্টোবর ১৯৭৩৫.

৪. মনজুরুল হক, বাংলাদেশ-জাপান মৈত্রীর সম্পর্কের তিন দশক, প্রথম আলো, ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০০২।

৫. আনোয়ারুল করিমের সাথে সুকুমার বিশ্বাসের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬, সংগৃহীত হয়েছে, Sukumar Biswas, Japan and the Emergence of Bangladesh, Agamee Prakashani, Dhaka, February 1998, p.243.

৬. অধ্যাপক নারার সাথে সুকুমার বিশ্বাসের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬, সংগৃহীত হয়েছে Sukumar Biswas opcit, p. 244

৭. Basic Strategies for Japan's Foreign Polcy in the 21st Century New Era, New Vision, New Ddiplomacy Task Force on Foreign Relations for the Prime Minister, Executive Summary (unofficial translation), November 28, 2002 p.1. http// : w.w.w.kantei.go.jp/foreign policy.

৮.এম শহীদুজ্জামান পারমাণবিক অস্ত্রায়ন ও দক্ষিণ এশিয়া ঃ তাত্ত্বিক পর্যালোচনা, দৈনিক ভোরের কাগজ, ১০ জুলাই ১৯৯৮।

৯. 'ভারতের আরো দুটি পারমাণবিক পরীক্ষা অবরোধ আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র', ভোরের কাগজ, ১৪ মে, ১৯৯৮।

১০. Abul Kalam, Japan and South Asia, Subsystemic Linkages and Developing Relationships, University Press Limited, 1996, p.95.

১১. দৈনিক ইত্তেফাক, ১মে, ১৯৯০।

১২. http//:w.w.w.mofa.go.jp.

১৩. The Bangladesh Observer, Dhaka, 14 Jan. 1972.

১৪. G. W. Choudhury "the Emergence of Bangladesh and the South Asian Triangle" in the Year Book of the World Affairs, Praeger, New York 1973, p.62.

১৫. দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২।

১৬. Mainichi Day News, 11 February, 1972, Quoted in Sukumar Biswas, op cit, 250

১৭. Talukder Maniruzzaman, "Bangladesh in 1975 : Fall of Mujib Regime and its Aftermath", Asian Survery, February, 1976 p.128.

১৮. The Bangladesh Times 18.03.76.

১৯. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮.০৭.৭৭।

২০. দেখুন Basic Facts : About the United Nations, Department of Public Information, United Nations, New York, 1998, pp.96-97. The Security Council by Resolution 242 of 22 November 1967, defined principles for a just and lasting peace in the Middle East. These are:1) Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict.2) Termination of all claims or states of belligerency and respect for and acknowledgement of the sovereignty, territorial integrity and political independence of every state in the area and their right to live in peace within secure and recognized boundaries, free from threats or acts of force. The resolution also affirmed or acts of force. The resolution also affirmed the need to settle the refugee problem. The Security Council adapted Resolution 338 of 22 October, 1973 which reaffirms the principles of Resolution 242 and calls for negotiations aimed at a just and durable peace.

২১. দৈনিক বাংলা, ০৯.০৪.৭৮।

২২. The Bangladesh Observer, 30.11.1978.

২৩. The Bangladesh Observer, 3 September, 1979.

২৪. দৈনিক বাংলা, ১৪.০৮.৮৭।

২৫. বিস্তারিত দেখুন : আনু মাহমুদ, সার্ক ঃ এ্যাপেক ঃ ডি-৮ ঃ ইকো-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ফোরাম, ঐতিহ্য, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃ.:১১। উলে-খ্য, '১৯৮৩ সালে দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশ (বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, ভুটান) নিয়ে গঠিত হয়েছিলো দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক (SAARC) সংস্থা। এটি আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছিল ১৯৮৫ সালে। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়া হচ্ছে এ সংস্থার প্রধান লক্ষ্য।

২৬. দৈনিক সংবাদ, ১৩.৮.৮৭।

২৭. দৈনিক বাংলা, ১৫.৮.৮৭।

২৮. সাপ্তাহিক রোববার, ৬ মে, ৯০।

২৯. দৈনিক ইত্তেফাক, ১২.১১.৯০।

৩০. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭.০২.৯১।

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ:৩৯।

৩২. সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৫ এপ্রিল, ৯৪ ।

৩৩. দৈনিক ইত্তেফাক, ০১.০৩.৯৫ ।

৩৪. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫.০৬.৯৬ ।

৩৫. পাক্ষিক চিন্তা, সংখ্যা ১৮-১৯, ১৫ জুন, ১৯৯৬ ।

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ:৩৬ ।

৩৭. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩.১২.৯৬ ।

৩৮. দৈনিক ইত্তেফাক, ০৩.১২.৯৭ ।

৩৯. আনু মাহমুদ, পূর্বোক্ত, পৃ: ২০৪ ।

৪০. http//:w.w.w.mofa.go.jp.com

৪১. The Daily Star, ০২.১২.২০০১ ।

৪২. মনজুরুল হক, "বাংলাদেশ-জাপান; মৈত্রী সম্পর্কের তিন দশক", প্রথম আলো, ১০.০২.২০০২ ।